History (UG)
4th Sem
Paper – SEC

এন.পি.টি. (Nuclear Nonpoliferation Treaty) – পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর বীভৎস্য চিত্রই এন.পি.টি-র প্রেক্ষাপট রচনা করে দেয়। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোসিমায় পৃথিবীর প্রথম আণবিক হাইড্রোজেন বোমা কেড়ে নেয় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের প্রাণ। তিনদিন পর নাগাসাকি শহরে দ্বিতীয় বোমাঘাতে প্রাণ হারান প্রায় ৭০ হাজার সাধারণ নিরপরাধ নাগরিক। ইতিহাসের এই দুটি দিন পৃথিবীর সমস্ত মারণাস্ত্রকে পেছনে ফেলে প্রমাণ করে দেয় পারমাণবিক অস্ত্রের প্রকৃত দানবিক ক্ষমতাকে। যুদ্ধের এই ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে পরিত্রাণের জন্য তৈরি হয় এন.পি.আর. (N.P.R.– Nuclear Non-Proliferation Regime) – যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের এক বিশেষ উদ্যোগ।

১৯৪৬ সালে পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় বারুচ পরিকল্পনা (Baruch plan)। কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতায় সেটি বাতিল হয়ে যায়। যদিও ১৯৫৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার বারুচ পরিকল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনে এক অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার নাম 'পারমাণবিক শান্তি' (Atoms for peace)।

১৯৫৭ সালেই তৈরি হয় আই.এ.ই.এ. (IAEA– International Atomic Energy Agency) যা জাতিপুঞ্জের একটি সংস্থা হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে রাশিয়া ও আমেরিকা কিউবার মিসাইল সমস্যাতে দুই প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র প্রায় পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে তারা পরস্পর ১৯৬৩ সালে স্বাক্ষরিত করে পিটিবিটি (PTBT– Partial Test Ban Treaty)। কিন্তু ফ্রান্স ও চীনের সম্মতি লাভ করতে এই চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার জন্য সেটি কার্যকর হয়নি। শেষ বারের মতো জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিটিতে তীব্র বিতর্কের পর ১৯৬৮ সালে ১লা জুলাই পারমাণবিক অস্ত্র-প্রসার রোধ চুক্তি (NPT– Nuclear Non-Proliferation Treaty) স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ তা কার্যকর করা হয়। সেই সময়ে প্রায় ৭০টি দেশ স্বাক্ষর করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯১। প্রধানত তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে তারা চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত করে। যথা –

(ক) ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করা।

(খ) পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার বন্ধ ও তার শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা।

(গ) অস্ত্র প্রতিযোগিতায় পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করণের পাশাপাশি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাহিত করা।

এনপিটি-র স্বাক্ষর পত্রে তার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা সদস্য রাষ্ট্রগুলি মান্য করবে, যথা –

* চুক্তির ১নং ধারা অনুযায়ী NWS (Nuclear Weapon States) বা পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারে পারমাণবিক শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলিকে কোনরূপ পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে না এবং কোনভাবেই অস্ত্র নির্মাণে সাহায্য ও উৎসাহ দেবে না।

* চুক্তির ২নং ধারায় বলা হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলি পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা অস্ত্র তৈরির কৌশল, ফর্মূলা বা প্রয়োজনীয় পদার্থ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নিকট কোনরূপ সাহায্য নেবে না।

* ৩নং ধারা অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলি পারমাণবিক শক্তিকে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তা তদারকির জন্য আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) গঠন করা হবে। অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রগুলি IAEA-র নির্দেশাবলী মেনে চলবে।

* ৪নং ধারায় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক গবেষণার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

* ৫নং ধারা অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়।

* ৬নং ধারায় পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে যে কোন প্রকার পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

* ৭নং ধারা অনুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

* ৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

যদিও চুক্তিটি ২৫ বছরের জন্য কার্যকর ছিল, কিন্তু চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ১৯৯৫ সালের ১১ মে পর্যালোচনা সম্মেলন (Review Conference)-এ এইচুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্প্রসারণ করে। সেই হিসাবে ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০ ও ১৯৯৫ সালের পর ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১৫ সালে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির পর্যালোচনা সম্মেলন (Review Conference) অনুষ্ঠিত হয়।

Comprehensive Test Ban Treaty / সি.টি.বি.টি. :

পি.টি.বি.টি. ও এন.পি.টি. নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বজনীন পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ লাভ করার ব্যাপারে এই চুক্তিগুলি সফলতা অর্জন করতে পারেনি, বিশেষত ঠান্ডাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চুক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বের নিকট নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। সর্বত্র পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালে PTBT-তে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির একটি সংশোধনমূলক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ১৯৯৪ সালে জানুয়ারি মাসে জেনেভাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর্থনে CTBT সংক্রান্ত আলাপ-আলোপচনা শুরু হয়। এই চুক্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত খসড়াটি ১২৭টি রাষ্ট্র সম্মতি জানিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার নিকট প্রেরণ করে এবং ১৯৯৬ সালে ১০ সেপ্টেম্বর CTBT সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত হয়। ঐ বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে চুক্তিটিতে ৭১টি দেশ স্বাক্ষর করে। এখন পর্যন্ত ১৮২ টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৫৪টি দেশ অনুমোদন দিয়েছে। CTBT চুক্তিপত্রটি একটি প্রস্তাবনা সহ দুটি পরিশিষ্ট অংশ, একটি অঙ্গীকারপত্র ও ১৭টি ধারার সমন্বয়ে গঠিত।

সিটিবিটি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। চুক্তির ২নং পরিশিষ্টে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ৪৪টি দেশের নাম আছে যারা স্বাক্ষর ও অনুমোদন করলেই চুক্তিটি কার্যকর হবে। না হলে সিটিবিটি কেবল চুক্তি আকারেই থেকে যাবে। এই ৪৪টি দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও ইসরায়েলের মতো দেশ রয়েছে।

CTBT-র প্রস্তাবনায় বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস এবং সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের ওপর গুরুত্ব রোপ করা হয়। এর অনিবার্য লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ। সিটিবিটি-র ১ নং ধারায় বলা হয়েছে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি যে কোন ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষার জন্য বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা প্রতিরোধ করবে। চুক্তির ২ নং ধারায় সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মেলন, একটি কার্যনির্বাহী পর্ষদ এবং একটি সচিবালয় থাকবে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং এটি হচ্ছে চূড়ান্ত নীতি প্রণয়নকারী সংস্থা। সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত ৫১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে কার্যনির্বাহী পর্ষদ। এটি হবে চুক্তির প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। সচিবালয় আন্তর্জাতিক তথ্য কেন্দ্রের সূচনা সহ

চুক্তিটি বাস্তবে যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ করবে। চুক্তির ৩নং ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি জাতীয় স্তরে মেনে চলবে এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির এবং সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চুক্তির ৪নং ধারায় আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের কোথাও পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা তা দেখা ও চিহ্নিত করার এই ব্যবস্থার মাধ্যমে করা সম্ভব। চুক্তির ৫নং ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র চুক্তি ভঙ্গ করলে সম্মেলন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। চুক্তির লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সম্মেলনকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। চুক্তির ৬নং ধারায় অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চুক্তির ৭নং ধারা অনুযায়ী পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চুক্তির ৮নং ধারায় প্রতি দশ বছর অন্তর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মেলন (Review Conference) অনুষ্ঠিত হবার কথা বলা হয়েছে।

পররাষ্ট্রনীতির অর্থ, সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য এবং ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

নির্মলকুমার সাহু

"পররাষ্ট্রনীতি হল সেই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার বৃহৎ স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে।" – প্যাডলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln)।

বর্তমানের বিশ্বায়ন প্রভাবিত ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরশীল যুগে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি সুসংসত ও সুনির্দিষ্ট নীতি ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার পররাষ্ট্রনীতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। পররাষ্ট্রনীতি হল রাষ্ট্রের কতকগুলি নীতির সমষ্টি যা অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে। পররাষ্ট্রনীতি হল জাতীয় নীতির সেই অংশ বিশেষ যা একটি রাষ্ট্র অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। জাতীয় স্বার্থের পূর্ণতা, সুরক্ষা ও বিস্তার প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির শুধু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই ন; বরং এটি পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়। এটি সততঃ প্রভাবিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ, মতাদর্শ, সামরিক শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সর্বোপরি প্রচলিত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদির দ্বারা। রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও তার অভিমুখ নির্ধারিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মাধ্যমে। যথা – রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, তার আন্তঃ-নির্ভরশীলতা, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল।

একদিকে একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানা সংহতি নীতিকে যেমন সুরক্ষিত করে, তেমনি আন্তঃ-নির্ভরশীলতা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানকে আবশ্যক করে তোলে।

সংজ্ঞা (Definition) ঃ পররাষ্ট্রনীতির অর্থ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণেই পররাষ্ট্রনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সি.সি. রোডি (C.C. Rodee) এর মতানুযায়ী, "পররাষ্ট্রনীতি হল সেই সকল নীতির সমষ্টি যার দ্বারা একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করে এবং অন্য রাষ্ট্রের ব্যবহারকে পরিবর্তন করে।"

চার্লস বার্টন মার্শাল (Charles Burton Marshall) বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতকগুলি কার্যকলাপ সম্পাদন করে এবং এদের সমষ্টিই পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়।"

এফ.এইচ. হার্টম্যান (F.H. Hartmann) এর মতে, "স্বেচ্ছায় মনোনীত জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত সুসম্বন্ধ বিবৃতিকে পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়।"

অধ্যাপক জোসেফ ফ্রাঙ্কেল (Prof. Joseph Frankel) বলেন যে, "পররাষ্ট্রনীতি হল সিদ্ধান্ত ও কার্যকারিতার সমন্বয় যা একটি রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রগুলির সাথে নির্ধারিত সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করে।"

পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক টেলর (Prof. Taylor) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "Foreign policy of a sort will go on so long as there are sovereign states". অন্য একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে (According to one scholar), "A State without foreign policy is like a ship without radar which drifts aimlessly without any direction by every storm and sweep of events."

পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে চিন্তানায়করা কার্যকরী পরিকল্পনা অথবা নীতির বাস্তবায়িতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যাই হোক প্রত্যেকেই একমত যে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি অন্য একটি দেশের রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলীর ওপর নির্ভরশীল।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) পররাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানা, সংহতি ও নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

(২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা পররাষ্ট্রনীতির অপর উদ্দেশ্য।

(৩) সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট দেশে পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে সদাসর্বদা সচেষ্ট হয়।

(৪) দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকেও অক্ষুন্ন রাখা পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

(৫) পরিশেষে পররাষ্ট্রনীতি, সংশ্লিষ্ট দেশের প্রভাব আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত করে।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি (Indian Foreign Policy) ঃ

কোন রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া তার প্রগতি ঘটাতে পারে না। সেই কারণে প্রত্যেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি আছে এবং ভারত এর ব্যতিক্রমী নয়। যদিও এই বৃহৎকায় ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়, তবুও তার পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় মূল নীতি সমূহ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে সংগঠিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির রূপকার বলে অভিহিত করা হয়। নেহরু একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমনন্তরীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত তার বর্ণিত সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে একটি দিশা হিসাবে কাজ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে সকল ঘটনাবলী ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলি হল – ঠান্ডাযুদ্ধ, জোট নিরপেক্ষতা, বিশ্ববিভক্তিকরণ, সামরিক সন্ধি, মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের আবির্ভাব এবং উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কুপ্রভাব ইত্যাদি। এতদ্ সত্ত্বেও বলা যায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি স্থিতিশীল নয় বরং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গৃহিত হয়েছিল প্রাক স্বাধীনতা পর্বের ১৯৩৮ সালের হরিপুরা বাৎসরিক অধিবেশনে। এই অধিবেশনে ঘোষিত হয়েছিল যে, "The people of India desire to live in peace and friendship with their neighbours and with all other countries and for this purpose wish to remove all causes of conflict between them...In order, therefore, to establish world peace on enduring basis, imperialism and exploitation of one people by another must end."

পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ১৯৪৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর করেন। তিনি বলেন, "India's foreign policy is rooted in India's citilization and traditions, India's struggle for freedom, India's geographical position and India's quest for peace, security, development and a place in the sun."

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রকৃতিগত ভাবে স্বল্পবিস্তর নীতি ও আদর্শ নির্ভর। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান একটি নতুন রূপ ধারণ করেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য (Objectives of Indian Foreign Policy ঃ

পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রধান রূপকার। তার মতে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ –

(ক) নিজস্ব সীমানা রক্ষা করা ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্মান দেওয়া।

(খ) বিশ্বশান্তি বজায় রাখা।

(গ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

(ঘ) অন্যান্য রাষ্ট্রে ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

(ঙ) জাতি ও ও বর্ণবিদ্বেষ উচ্ছেদ করা।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য (Features of Indian Foreign Policy) ঃ

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচিত হল ঃ

(১) **জোর নিরপেক্ষতা (Non-Alignment) ঃ** ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জোট নিরপেক্ষতা। আন্তর্জাতিক স্তরে দুটি ক্ষমতা কেন্দ্র যথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে এই নীতিকে অনুসরণ করে আসছে। জোট নিরপেক্ষ নীতি শুধুমাত্র ভারতে নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ পরিত্যাগ করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি, সুরক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি পন্ডিত জওহরলাল নেহরুের একটি মহৎ অবদান।

(২) **উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা (Anti-Colonialism and Anti-Imperialism) ঃ** উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা ভারতীয় বৈদেশিক নীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের প্রতি নির্মম অত্যাচার ও নিষ্পেষণের ফলে এই নীতির সূত্রপাত। ভারত সেই সমস্ত দেশগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে যারা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের জনগণের প্রতি ভারত সহমর্মিতার হাত বাড়ায়। বর্তমানে ভারত নয়া উপনিবেশবাদকে সকল দিক থেকে বিরোধিতা করে চলেছে।

(৩) **জাতিত্ববাদের বিরোধিতা (Opposition to Racialism) ঃ** জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব গঠনে ভারতবর্ষ সদা সর্বদা জোর দিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক

স্তরে ভারতবর্ষই প্রথম জাতিগত বৈষম্যের সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত শ্রেণী বৈষম্যকে প্রতিহত করে। ১৯৫২ সালে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ভারত মিলিতভাবে শ্রেণী বৈষম্যের সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করে। এই সম্মেলনে দৃঢ় প্রতিবাদ করে ভারত জানায় যে জাতিবিদ্বেষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আইন লঙ্ঘন করছে ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন করেছে।

(৪) **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার (Promotion of World Peace & Security)** ঃ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও বিশ্ব স্তরে বিভিন্ন দেশগুলির সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতা স্থাপন করা ভারতীয় বৈদেশিক নীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের মূল লক্ষ্য হল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ তম অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাস (Faith in Peaceful Coexistence and Cooperation)** ঃ ভারতবর্ষ জোট নিরপেক্ষ নীতি ব্যতিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে। অন্যান্য নীতিগুলির মতোই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিটি বর্তমানে প্রচলিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বতীয় ইস্যুকে ভিত্তি করে চীন ও ভারতের মধ্যে যে পঞ্চশীল চুক্তি ১৯৫৪ সালের ২৯ শে মে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চশীল নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল – (ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রর সীমানা, সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা ও সম্মান দেওয়া উচিত। (খ) অনাক্রমন নীতি বজায় রাখা। (গ) এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। (ঘ) সাম্য এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং (ঙ) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের পঞ্চশীল নীতির একটি উল্লেখ্যনীয় অবদান ছিল।

(৬) **এশিয়া মহাদেশের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব (Special Bias for Asia)** ঃ যদিও বিশ্বের সকল দেশের প্রতি ভারত সহযোগিতা বজায় রেখেছিল তথাপি এর পররাষ্ট্রনীতিকে এশিয়া মহাদেশের প্রতি বিশেষ সমর্থন ছিল। ভারত এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন অধিবেশনের মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন

অধিবেশনে পন্ডিত নেহরু দৃঢ়ভাবে বলেন যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারত এশিয়া মহাদেশে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নূতন দিশা দেখাতে পারবে। এই নীতির মধ্য দিয়ে সার্ক (দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

(৭) **কমনওয়েলথ দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (Intimate Relations with Commonwealth)** ঃ কমনওয়েলথ দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ভারতের ভৌগোলিক নীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা লাভের আশায় কমনওয়েলথ-এর সদস্য পদ গ্রহণ করে। এই সদস্যপদ লাভ করার পর ভারত বিভিন্ন কমনওয়েলথ সম্মেলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

(৮) **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি বিশ্বস্ততা (Faith in the United Nations)** ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ভারত তার একটি সদস্য হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীকে ভারত সদা সর্বদা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিমিত্ত ও কার্যকারিতার দিকে ভারত সামরিক ও অসামরিক বাহিনী প্রদান করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রকাশ করে। এটা সুস্পষ্ট ঘটনা যে কোরিয়া ও ভিয়েতনাম সংকট এবং ভারত-চীন দ্বন্দ্বে ভারত একটি প্রভাবশালী ভূমিকা নেয়।

(৯) **পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ (Support for Disarmament)** ঃ ভারতের বৈদেশিক নীতি সর্বদা পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতি। এই দেশ সর্বদা পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রত্যাহারের প্রতি আস্থাশীল। ১৯৮৫ সালে নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের ও নিরস্ত্রীকরণের জোরাল প্রস্তাব আনা হয়।

(১০) **পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার (Peaceful Use of Nuclear Energy)** ঃ যদিও ভারতবর্ষ পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের বিরোধী তবুও এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উন্নতি বিধানে সে আস্থাশীল। ভারত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর ব্যবহার ও হস্তান্তরের সমর্থক।

(১১) নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ (Special Emphasis on Moral Principles)ঃ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ। ভারতবর্ষ ধারাবাহিকভাবে জাতীয় স্বার্থ পূরণে প্রযুক্তিনীতির পবিত্রতায় আস্থাশীল। এই দেশ উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী এবং কখনই অন্যরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য অধিকারের পক্ষপাতি নয়। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাকিস্তানের ভূখণ্ড পুরনায় তাকে হস্তান্তর করে। ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ও সন্ধির মাধ্যমে সমস্ত রকম দ্বন্দ্বের সমাধানে সচেষ্ট হয়।

ভারত ও তার পারমাণবিক নীতি

নির্মলকুমার সাহু

ধর্ম ও দর্শনের পীঠস্থান এই বিশাল ভারতবর্ষ জন্ম-লগ্ন থেকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পূর্ণ বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি (Hiroshima & Nagasaki) শহরের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে জীবন ও সম্পত্তির যে ব্যাপক ক্ষয়সাধন ঘটেছিলো, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের প্রাক-স্বাধীনতার রাজনীতিবিদ্গণ গভীরভাবে মর্মাহত হন। ভারত সর্বতোভাবে এই ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে এর কুফল থেকে মুক্ত করতে প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। শুধু তাই নয়, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্রম প্রসারের বিরুদ্ধে ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জন-সচেতনতা গড়ে তোলে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তথা পারমাণবিক শক্তি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ণধার পন্ডিত জওহরলাল নেহরু (Pandit Jawaharlal Nehru) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে একাধিকবার প্রকাশ করেন যে ভারত তার পারমাণবিক শক্তি ভাণ্ডারকে সদাসর্বদা জন-কল্যামের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মে নিয়োজিত করতে চায় না।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের নিষিদ্ধকরণ ও উচ্ছেদকরণের পক্ষে সওয়াল করে। ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় (General Assembly of U.N.O.) ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, ভারত তার পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। ভারত পূর্ণ মাত্রায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শুধু বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্যই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সীমিতকরণের যুক্তিকে ভারত অবৈধ বলে তীব্র সমালোচনা করে। তিনি পুরনায় বলেন, পারমাণবিক শক্তিকে খুবই সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত এবং কোন পরিস্থিতিতে তা যদি যুদ্ধের একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হয় তবুও তাকে ভারত সমর্থন করবে না।

ভারতের পারমাণবিক নীতির ক্রম বিবর্তন (Evolution India's Nuclear Policy) ঃ

ভারতের পারমাণবিক নীতি ১৯৪০ দশকের শেষ দিকে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি ডঃ হোমি ভাবা (Dr. Homi Bhabha) ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর (Jawaharlal Nehru) সুস্থ ও উন্নত চিন্তাধারায় গড়ে উঠেছিল। পারমাণবিক শক্তিকে কৌশলে

সামরিক বাহিনীর পরিচালনার কাজে আবশ্যকীয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নেহরু ১৯৪৮ সালে পারমাণবিক শক্তি কমিশন (Atomic Energy Commission) গঠন করেন।

১৯৫০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত এশিয়া মহাদেশের সর্বপ্রথম পারমাণবিক রিঅ্যাকটর (Nuclear Reactor) অপ্সরা (Apsara) প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃহদায়তন পারমাণবিক কর্ম পরিকল্পনার শুভারম্ভ ঘটে।

১৯৬০ এর দশকে গবেষণা কর্মসূচীর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পারমাণবিক মতবাদ (Nuclear Option) এর সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬০ সালে সাইরাস রিঅ্যাকটর (Cirus Reactor) এর শুভারম্ভের পর পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, "We are approaching a stage when it is possible for us...to make atomic weapons."নেহরুর দেহাবসানের চার মাস পরে ১৯৬৪ সালে চীন যখন তার প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে ডঃ হোমি ভাবা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে ভারত যদি তার পারমাণবিক প্রক্রিয়া শুভারম্ভের সিদ্ধান্ত বর্তমানে গ্রহণ করে তবে ১৮ মাসের মধ্যে ইহা একটি পরমাণু বোমা তৈরি করতে সক্ষম হবে।

পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (Lal Bahadur Shastri) নতুন পারমাণবিক কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। কিন্তু সে সময়ের কিছু দুঃখজনক ঘটনাবলী যথা – ১৯৬৬ সালে তাকখন্দ চুক্তির (Tashkent Treaty) একদিনের পর শাস্ত্রীজির হৃদরোগে দেহাবসান, ইউরোপে বিমান দুর্ঘটনায় ডঃ হোমি ভাবার আকস্মিক মৃত্যু এবং জাতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভারতের পারমাণবিক কর্ম-পরিকল্পনার গতি স্থির হয়ে পড়ে।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (Mrs. Indira Gandhi) প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তার কার্যকালে ভারতের পারমাণিক ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। শ্রীমতী গান্ধীর সক্রিয় প্রয়াসে ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে পোখরান-১ (Pokhran-1) এর পরীক্ষণ হয় যা ভারতের পারমাণবিক নীতির নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে এবং সমগ্র বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষণের উপর মন্তব্য করে হেনরী কিসিংগর (Henry Kissinger) মার্কিন কংগ্রেসে বলেন যে, "We objected strongly, but since there was no violation of U.S. aggrements involved, we had no specific leverage on which to bring our objections to bear." এই পরীক্ষণ ১৯৬৮ সালের পারমাণবিক পরীক্ষণ নিষিদ্ধ চুক্তি (N.P.T.)-র নিয়মনীতিকে লঙ্ঘন করে। ১৯৭৪ সালের পরীক্ষণে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না

থাকায় ভারত নিজেকে একটি পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করতে পারে না। ১৯৭৭ সালের জনতা দলের দরকার এবং ১৯৭৯ সালের চৌধুরি চরণ সিং (Chaudhury Charan Singh) সরকার এই ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

১৯৭০ দশকের অন্তিম পর্বে পাকিস্তানের পারমাণবিক পরীক্ষণের সফলতা ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৮১ সালে পুনরায় একটিপরীক্ষা করার অনুপ্রেরণা জোগায়। ক্ষেপনাস্ত্র সামর্থ্যের অভাব প্রত্যক্ষভাবে ভারতকে পারমাণবিক পরীক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত ১৯৮৩ সালে ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র (Ballistic Missile) তৈরি করে। ১৯৮৪ সালের ৩১ শে অক্টোবরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর রাজীব গান্ধী (Rajiv Gandhi) প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮৯ সালে ভারত ক্ষেপনাস্ত্র অগ্নির প্রথম পরীক্ষণের পর রাজীব গান্ধী দৃঢ়ভাবে বলেন যে, "Ambassadors of certain foreign powers threatening punitive sanctions. I told them clearly that India would carry out the launch and we would not change our decision under pressure." বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও রাজীব গান্ধী জাতীয় স্বার্থে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

রাজীব গান্ধীর হত্যার পর ১৯৮৯ সালের ২রা ডিসেম্বর ভি.পি. সিং (V.P. Singh) প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁর দৃঢ় সমর্থনে ভারত তার পারমাণবিক মতবাদের (Nuclear Doctrine) সম্পূর্ণ করে এবং ১৯৯০ সালের চন্দ্রশেখর (Chandra Sekhar) সরকার তার স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ পদক্ষেপ অবলম্বন করেন। যাই হোক না কেন, ভারতের পারমাণবিক নীতি ১৯৯০-এর দশকে গভীর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় যখন পাঁচটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে পারমাণবিক পরীক্ষণ নিষিদ্ধকে বিশ্ব আইন হিসাবে কার্যকরী করেন। পারমাণবিক পরীক্ষণ নিষিদ্ধ চুক্তির (N.P.T.) মাধ্যমে নিজেদের কর্তৃত্ব বৈধতার পর এই শক্তিগুলি ব্যাপক পারমাণবিক পরীক্ষণ নিষিদ্ধ চুক্তির (C.T.B.T.) দ্বারা ভারতকে নিশানা করেন। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ (Gulf War) ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় (New World Order) শুধুমাত্র একটি মহাশক্তির (Super Power) আধিপত্য এবং অন্য দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ভারতের বন্ধুত্বের পতন রাজীব গান্ধীর সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র সম্মেলনে (Press Conference) রাজীব গান্ধী বলেন, "ভারতের পারমাণবিক নীতির ব্যাপক পূর্ণ মূল্যায়ণের প্রস্তাব তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করেন।" ১৯৯১ সালের ২১ শে জুন জোট সরকারের

(Coalition Government) দায়িত্ব পি.ভি. নরসিংহ রাও (P.V. Narasimha Rao) গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অগ্নি নামক ত্রিস্তরীয় উন্নত ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষণের সফলতার সাথে ভারতের পারমাণবিক নীতির বাস্তব কার্যকারিতার শুভারম্ভ হয়। ১৯৯৫ সালে নরসিংহ রাও একটি পারমাণবিক পরীক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু পরিণাম স্বরূপ, ইহা স্থগিত হয়ে থাকে।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ১১তম লোকসভা নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় একটি ত্রিশঙ্কু সংসদ সৃষ্টি হয়। এর ফলে দু-বছরের মধ্যে তিনজন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসীন হয়। সুতরাং ১৯৯৬ সালের ১৬ই মে অটল বিহারী বাজপায়ী (Atal Bihari Vajpayee), ১৯৯৬ সালে ১লা জুনে এইচ.ডি. দেবগৌড়া (H.D. Deve Gowda) এবং ১৯৯৭ সালের ২১ শে এপ্রিল আই.কে. গুজরাল (I.K. Gujral) কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ না করলেও তারা এই ইচ্ছাকে বজায় রাখতে ব্যাপক পারমাণবিক নিষিদ্ধ চুক্তি (C.T.B.T.) -তে স্বাক্ষরতা প্রদান করেন নি। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ১৯ শে মার্চ অটল বিহারী বাজপায়ী (Atal Bihari Vajpayee) দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই ভারতের এই দীর্ঘ পারমাণবিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ই মে পোখরান–২ (Pokhran-II) পরীক্ষণ দেশকে স্বাধীন ও আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলে। এই পরীক্ষণের ফলে ভারত বিশ্ব দরবারে একটি গর্বিত পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা লাভকরে। ১৯৯৮ সালের ২৭ শে মে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ী ভারতের পারমাণবিক নীতির বিবর্তন (Evolution of India's Nuclear Policy) নামক একটি শ্বেতপত্র লোক সভায় উত্থাপন করেন এবং এই ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রেক্ষাপটে তিনি সুস্পষ্ট করেন যে ভারতীয় পারমাণবিক নীতির দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা উদ্দেশ্য হল প্রথম ব্যবহার নয় (No-First Use) ও পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার নয় (No Use Against Non-Nuclear States)।

২০০৪ সালের ২২ই মে ডঃ মনমোহন সিং (Dr. Manmohan Singh) ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র নীতির সব-দিক বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার কার্যকালে ভারত মার্কিন অসামরিক চুক্তির (Indo-US Civil Nuclear Deal) মাধ্যমে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে। ২০০৮ সালের ১০ই অক্টোবর ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা (Barack Obama)-এর শাসনকালে ডঃ মনমোহন সিং মার্কিন সফরে যান এবং তাদের মধ্যে বাণিজ্য ও

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত একাধিক আলোচনা হয়। কিছু সমস্যা সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ বিজ্ঞানে সহযোগতা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি (Indo-US Civilian Nuclear Agreement) ঃ

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ১২৩ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি (Indo-Us Nuclear Agreement) নামে পরিচিত। এই চুক্তির খসড়া ২০০৫ সালে ১৮ই জুলাই শুভারম্ভ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ (Dr. Manmohan Singh) এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের (George W. Bush) যৌথ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই চুক্তিটির কার্যকারিতার জন্যে প্রায় তিন বছরের ঊর্দ্ধে সময় লাগে কারণ বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এটি অতিক্রান্ত হয়, এমনকি মার্কিন জাতীয় আইন এবং ১৯৫৪ সালের পারমাণবিক শক্তি আইনের (Atomic Energy Act of 1954) সংশোধন করতে হয়। ভারত-মার্কিন পারমাণবিক জ্বালানি ও প্রযুক্তি বিদ্যার সহযোগিতায় এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করার উদ্দেশ্যে মনমোহন সিং সরকার উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই কারণে তিনি ২০০৫ সালে জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। এর ফলে ভারত-মার্কিন অসামরিক চুক্তির ওপর একাধিক বার আলোচনা হয়। এরপর ২০০৬ সালের ১লা মার্চে মার্কিন রাষ্ট্রপতি র্জ ডব্লিউ বুশ (George W. Bush) ভারত সফরে আসেন। এই সময় পারমাণবিক চুক্তি সংক্রান্ত বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (International Atomic Energy Agency) আইন অনুযায়ী ভারত, মার্কিন পারমাণবিক জ্বালানি ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ লাভ করে। ২০০৮ সালের ১লা আগস্টে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অনুমোদনের পর ভারতসহ অসামরিক পারমাণবিক বাণিজ্যের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যোগানকারী রাষ্ট্রগুলিকে (Nuclear Supplier Groups) অনুরোধ করে। ২০০৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রতিনিধি কক্ষ (House of Representatives) এবং ২০০৮ সালের ১লা অক্টোবরে মার্কিন সিনেটের (Senate) অনুমোদনের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ (George W. Bush) স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং পারমাণবিক জ্বালানি ও প্রযুক্তি বিদ্যা ক্রয়ের অনুমতি ভারতকে প্রদান করা হয়. সর্বোপরি ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি (Indo-US Civil Nuclear Agreement) তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জ্জী (Pranab

Mukherjee) ও মার্কিন রাষ্ট্রসচিব কন্ডোলিজা রাইসের (Condoleezza Rice) মধ্যে ২০০৮ সালের ১০ই অক্টোবরে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাক্ষরিত হয়।

Selected References :

1. Dutt., V.P., *India's Foreign Policy*, National Book Trust, New Delhi, 2009.
2. Chandra, Prakash, & Arora, Prem, *Comparative Politics And International REIations*, Cosmos Bookhieve (P) Ltd., New Delhi.
3. Rajaram, Kalpana, *India And the World*, Spectrum Books Pvt. Ltd., New Delhi, 2002.
4. Mathews, Jojo & Gautam K. Manish, *Indian Policy & Constitution*, ALS, Delhi, 2006.
5. Pandey, Monohar, *General Knowledge*, Arhant Pub., Meerat, 2013.
6. en.wikipedia.org/wiki/India-United States_Civil_Nuclear_Agreement accessed on 10/05/2014.

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক : বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ডঃ কামারান এম.কে. মণ্ডল

১৯৪৭ সালে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে, ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক, ভোগোলিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত দিক থেকে মিল থাকলেও দুই দেশের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস অসহযোগিতা, পারস্পরিক ঘৃণা ও সন্দেহ তাদের পিছু ছাড়েনি।

১৯৪৭ এ স্বাধীনতার পর ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে, কিন্তু পাকিস্তান তা পারে নি। পাকিস্তানে এসেছে একের পর এক সামরিক শাসন। স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে পাকিস্তান আমেরিকার শিবিরে যোগ দিয়ে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের সুযোগ পায়। পাকিস্তানের রাজনীতি সেনা নির্ভর এবং ঝোঁক বাড়ে সামরিক একনায়কতন্ত্রের দিকে। অন্যদিকে ভারত দুই মেরু রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে (ঘোষ ২০০৭ : ৩২৫)।

এই দুই দেশের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – কাশ্মীর সমস্যার, সীমান্তরেখা সমস্যা, সিয়াচেন হিমবাহ, সন্ত্রাসবাদ, পাকিস্তান থেকে আগত নদীর জল বন্টন ইত্যাদি। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে বলতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমির কথা একটু বলতে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কাশ্মীর তখনও একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই স্বীকৃত ছিল। কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের পক্ষে যাবে তা নিয়ে রাজা হরি সিং দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে পাকিস্তান সরকার মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের শাসক হিসেবে রাজপুত রাজাকে কিছুতেই মেনে নেবে না। অন্যদিকে যেহেতু ভারতের জাতীয়তাবাদী দল গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিল, সেই কারণে ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে হরি সিং-এর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই দুই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে হরিসিং কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে মুসলিম উপজাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর কাশ্মীর অভিযানের ফলে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে (ঘোষ ২০০৭ : ৩২৫–২৬)।

১৯৪৭ সালের ২২ শে অক্টোবর কাশ্মীরে উপজাতি আক্রমণ ঘটে এবং বাধ্য হয়ে হরি সিং ভারতের সাহায্য চান। ২৭ শে অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং হরি সিং-এর

প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা পত্রটি "Instrument of Accession" নামে পরিচিত। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু বলা হয় যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থায় কাশ্মীর একটি পৃথক মর্যাদা ভোগ করবে। কাশ্মীরের এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি পরে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয় (ঘোষ ২০০৭ : ৩২৮)।

১৯৪৮ সালের মধ্যে কাশ্মীরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে যখন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় সেই সময়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পাকিস্তান সমর্থিত হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই অংশটি পরিচিত হয় আজাদ কাশ্মীর নামে। দুই অংশের মধ্যবর্তী সীমানা নিয়ন্ত্রণরেখা হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ তাকে আন্তর্জাতিক সীমানায় মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় পাকিস্তান দাবি করতে থাকে যে যেহেতু কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীরা ভারতের বিরুদ্ধে সেই কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি এর একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান, অন্যদিকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কাশ্মীরের জনগণের রায় পৃথকভাবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে অধিকৃত এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল থেকে পাকিস্তান তার সমর্থিত হানাদারদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। এইভাবেই স্বাধীনতার পর ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি জটিল সমস্যা দেখা দেয় (ঘোষ ২০০৭ : ১২৯)।

যেহেতু দেশ বিভাজন ধর্মের ভিত্তিতে ঘটেছিল এবং কাশ্মীর একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য, তাই অনেকে মনে করেন কাশ্মীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি যুক্তিসঙ্গত। এরপর থেকে পাকিস্তানের প্রতি এবং বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যার প্রতি ভারতের মনোভাবও অনড় ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাশ্মীর বিষয়টিকে উত্থাপন করে কূটনৈতিক সমর্থন যোগাড় করার কৌশলও পাকিস্তান শুরু করে।

সামরিক শক্তি বলে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য ছিল। সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পাকিস্তান বরাবরই উদ্‌গ্রীব ছিল। পাকিস্তান শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন (South-East Asia Treaty Organisation) এবং ১৯৫৫ সালে বাগ্‌দাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (ভট্টাচার্য ২০০৭ : ২৩২)।

১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধ বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান শুরু করে এবং সামরিকভাবে পরাস্ত হয় ভারতের কাছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূত্রপাত খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৬২ সালে। স্বাধীনতার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে শান্তির জন্য চুক্তি বা আলোচনাও হয়। ফলস্বরূপ, কিছুদিনের জন্য শান্তি থাকলেও তা স্থায়ী রূপ পায়নি।

১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় হয়। একদিকে যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। এর ফলে ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রান অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় (ঘোষ ২০১৩ : ৯৪১)।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল তাসখন্দ-চুক্তির ফলে পুনরায় যুদ্ধ-বিরতির পর সীমারেখার ওপারে চলে যায়।

১৯৭১ সালের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে ভারতের অভূতপূর্ব সামরিক সাফল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রণতরীকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে। চীন ও ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য স্থাপন করে। ঠিক সেই সময় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে ফিরিয়ে নেয়। রাষ্ট্রসংঘ ভারতের বিরুদ্ধে আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দাসূচক প্রস্তাবকেও ভিটো করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় ও সেখানে সামরিক শাসনেরও অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিমলা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে (৩ জুলাই)। এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। সিমলা চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে সার্বভৌম অখণ্ডতা বজায় রাখা, যুদ্ধোত্তর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of Control) লঙ্ঘন না করা বা কোনওভাবে একক প্রয়াসে পরিবর্তন না করা এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কেবলমাত্র দ্বি-পাক্ষিক স্তরেই আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (ভট্টাচার্য ২০০৭ : ২৩২–৩৩)। কিছুদিনের জন্য দুি দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে পারমাণবিক বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়।

১৯৯৮ সালে ১১ই মে এবং ১৩ই মে বারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। পাকিস্তানও অল্প কিছুদিনের মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে কার্গিল যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের লাহোর শান্তি প্রক্রিয়ার পরে পাকিস্তান পরিকল্পিত ভাবে কার্গিল যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে এবং তার মধ্য দিয়ে চিরাচরিত ভারতের প্রতি বিরোধিতা ও বৈরিতাপূর্ণ মনোভাবকে পুনরায় প্রমাণ করে। এর পরে ২০০১ সালে আগ্রা সম্মেলনে ব্যর্থ হয় দুই দেশের কাশ্মীর সম্পর্কে অনড় মনোভাবের ফলে (ভট্টাচার্য ২০০৭ : ২৩৩)।

২০১৪ সালের দুই দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল হয় কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে। পাকিস্তানের দাবি যে, বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে কিন্তু ভারতের দাবি যে, কোন পূর্ব শর্ত মেনে কোন বৈঠক করা হবে না।

২০১৫ সালের জুলাই মাসের শেষে, উফাতে (রাশিয়া) সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সাক্ষাৎ হয়। তাতে দু দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকের কথা স্থির হয়। কিন্তু সেই বৈঠক ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ভেস্তে যায়, ঠিক ঐ কাশ্মীর ইস্যুকে নিয়েই (Pant, 2015)।

উল্লেখ্য যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির আরও একটি মূল কারণ হল সন্ত্রাসবাদ। ভারতের দাবি, পাকিস্তান সীমান্ত পারাপারের সন্ত্রাসকে সমর্থন ও মদত যোগাচ্ছে। সাম্প্রতিক ২০১৬ সালের দুটি উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা বলা যায়। ২ জানুয়ারী ২০১৬-তে জম্মু-কাশ্মিরের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় ৬ জঙ্গি। এতে ৭ জন ভারতীয় সেনা নিহত, এবং সন্দেহভাজন ৬ পাক-জঙ্গিই বন্দুক যুদ্ধে মারা যায়। ভারত-পাক যুগ্ম তদন্তকারী দল পাঠানকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটি ঘুরে দেখেন। পাক তদন্তকারী দল ইসলামাবাদে ফিরে গিয়ে জানায় পাকিস্তানকে অপদস্ত করতেই ভারত পরিকল্পনা করে এই হামলা ঘটিয়েছে। এর ফলে ভারত-পাক শান্তি আলোচনা আরও একবার ধাক্কা খায়। পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬- তে। সেদিন ভোর বেলায় উত্তর কাশ্মীরের সীমান্তরেখার কাছে উরি সেনাঘাঁটিতে হামলা চালায় সীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্দেহভাজ জঙ্গিরা। এই হামলায় ১৯ জন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু হয় এবং জখম হন ৩০ জন। হামলার নেপথ্যে কট্টরবাদী সংগঠন জঈশ-ঈ-মহম্মদ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। ঐ ঘাঁটিতে যখন হামলা চলে, সেই সময় জওয়ানদের মধ্যে দায়িত্বের ভার বদল

হচ্ছিল। ১০ ডোগরা রেজিমেন্টকে সরিয়ে ৬ বিহার রেজিমেন্টের জওয়ানরা ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিচ্ছিলেন। ঘন্টা পাঁচেকের লড়াইয়ে মারা যায় ঐ জঙ্গিও।

উরি সেনাঘাঁটিতে হামলার জেরে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র নিন্দার মুখে পড়ে পাকিস্তান। বিশ্বের নজরে পাকিস্তানকে এক ঘরে করার চেষ্টা করে ভারত। সীমান্তের উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ভারত-পাক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে খালি করে দেওয়া হয়। অনেক সংগঠন, এমনকি 'Social Media' যুদ্ধের পক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তানকে কড়া শাস্তি দেওয়ার পক্ষে লেখালেখি শুরু করে দেয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেয় ভারত। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে আচম্‌কা অভিযান চালিয়ে একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। এই অভিযানটির নাম 'সার্জিকাল স্ট্রাইক'। এর অর্থ, সরাসরি যুদ্ধ না করে স্বল্প সময়ের গোপন অভিযান এবং নির্দিষ্ট নিশানায় আচমকা অভিযান। এতে মারা যায় অন্তত ৩ জন জঙ্গি ও দুই পাক সেনা প্রধান। যদিও এ ধরনের কোন অভিযান হয়নি বলে বিবৃতি দেয় পাক-সরকার।

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে সার্ক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। পাকিস্তানে আয়োজিত সার্ক সম্মেলন বয়কট করে ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভূটান এবং শ্রীলঙ্কা। সার্ক সনদ অনুযায়ী সকলের সম্মতি ছাড়া সার্কের শিখর সম্মেলন সম্ভব নয়। ফলে সার্ক সম্মেলনই বাতিল হয়ে যায়।

Indian Motion Picture Producers Association (IMPPA) পাকিস্তানের নায়ক নায়িকা এবং সহযোগকারীরা যাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে কাজ করতে না পারে তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাকিস্তান সরকার ও ভারতের টিভি চ্যানেল ও রেডিও পাকিস্তানে চালানো বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দ্বিপাক্ষিত ক্রিকেট ম্যাচ অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, দুই দেশের মধ্যেসম্পর্ক ভালো করার জন্য কিছু কর্মোদ্যোগ (Confidence Building Measures) নেওয়া হয়েছে, যেমন – Cricket diplomacy – দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ চালু করা। ১৯৯৯ সালে Wagah Border দিয়ে দিল্লী লাহোর বাস সেবা চালু হওয়ার পর ২০০৫ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগর ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফরাবাদের মধ্যে বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে। ভারতের রাজস্থানের মুনাবাওয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের সিন্দ (Sind)

অঞ্চলের খোক্রাপারের মধ্যে রেল পরিষেবাও শুরু হয়েছে। দক্ষিণ-এশিয়ার সংগঠন SAARC যদিও জন্মলগ্ন থেকেই দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল, তবুও SAARC ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ এনে দিয়েছে (ঘোষ ২০১১ : ৯৩–৯৯)।

পরিশেষে বলা যায়, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি, এর কারণ হল দুই দেশের মধ্যে একে অপরের প্রতি গভীর অবিশ্বাস। উদার হৃদয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এবং সমঝোতার মনোভাব নিয়ে সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, স্বাভাবিক সম্পর্কের দিকে হয়তো এগিয়ে যাবে।

References :

ঘোষ, অঞ্জনা (২০১১), ঠাণ্ডাযুদ্ধের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : সংকট ও প্রবণতা, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

ঘোষ, নির্মলকান্তি এবংড. পিতম ঘোষ (২০১৩), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস।

ঘোষ, অলক কুমার (২০০৭), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০–২০০৬), কলকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স।

ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম এবং অনিন্দজ্যোতি মজুমদার (২০০৭), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা, কলকাতা : সেতু প্রকাশনী।

Pant, Harsh V. (2015), A Seismic Shift in India's Pakistan Policy, 25 August, The Diplomat, Japan.

Panda, Ankit (2016), "Gurdaspur, Pathankot and Now Uri : What are India's options", The Diplomat, 19 Sep., 2016.

The Hindu (2016), SAARC Summit Postponded Indefinitely, 1 October, 2016.

The Telegraph, Kolkata, 24th August, 2015.

The Times of India (2016), Uri Terror Attack, 18 Sep., 2016.

পারমাণবিক অস্ত্রপ্রচার রোধ চুক্তি (Nuclear Weapon Control)

পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তি (Nuclear Non-Proliferation Treaty) ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাব এবং তার ধ্বংসাত্মক পরিণতির ফলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করে। ১৯৫২ সালে গ্রেট ব্রিটেন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে সফল হয়। ১৯৬০ সালে ফ্রান্স এবং ১৯৬৪ সালে চিন পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়। এই পাঁচটি দেশ ছাড়াও বর্তমানে যেসব দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশের তালিকায় ঢুকে পড়েছে সেগুলি হল ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, ইরাক, ইজরায়েল, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল।

চুক্তি ঃ পারমাণবিক শক্তি হিসাবে বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ শক্তির নীতি মোটামুটি একইরকম। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে তারা নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বজায় রাখতে চায়। কিন্তু অন্য কোনো দেশ পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন করবে না বা উৎপাদন করে থাকলে তা নষ্ট করে দেবে। কারণ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠবে এবং সাধারণভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই পারমাণবিক শক্তির প্রসার রোধকল্পে ওই পাঁচটি দেশ উদ্যোগ নেয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালের জুন মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তি (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) গৃহীত হয়। ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ চুক্তিটি ২৫ বছরের জন্য কার্যকর হয়। ১৯৭০ সালে ৫টি বৃহৎ শক্তিসহ ১৭০ টি দেশ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ভারত, পাকিস্তান ও ইজরায়েল ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। NPT চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলি এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে, তারা কোনোভাবেই পারমামবিক বিস্ফোরণ বা অস্ত্র তৈরির কৌশল, ফর্মূলা বা প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি অর্জন করবে না। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলিও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার করে যে, এ ধরনের কোনো সহায়তাই অন্যান্য দেশগুলিকে দেবে না বা প্রযুক্তির হস্তান্তর করবে না।

বাস্তব রূপায়ণ ঃ কার্যক্ষেত্রে এইসব অঙ্গীকার মানা হয়নি। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পারমাণবিক অস্ত্র যা হ্রাস করা হয়েছে তার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। বেশ কয়েকটি

পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে অথবা তৈরি করার সামর্থ্য অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাপারে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির সাহায্যও তারা পেয়েছে।

১৯৭০ সালে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিটি (NPT) কার্যকর হবার সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১,০০,০০০-এর বেশি পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদিত হয়েছে। প্রায় ২০০০ বার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'স্ট্রাটেজিক আর্মস লিমিটেশন চুক্তি' (SALT) অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করলেও বর্তমানে ওই দুই দেশের হাতে প্রায় ৬০,০০০ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলি শুধু নিজেদের হাতে অস্ত্র রেখে ক্ষান্ত থাকেনি, তারা বেশ কয়েকটি দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের সামর্থ্য অর্জনে সহযোগিতা করেছে। ইজরায়েল, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলি কোনো-না-কোনো পরমাণু শক্তিধর দেশের সহায়তায় পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ক্যালভোকোরেসি (Calvocoressi) মন্তব্য করেন – "The advanced powers which were helping developing states to build reactors were engaging in Proliferation।"

পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তি অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে কোনো দেশই এই শর্ত অনুযায়ী কাজ করে না। প্রতিটি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী দেশই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এসব নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করা যায়নি। বরং আরও মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

মেয়াদ ঃ শুরুতে NPT চুক্তি ২৫ বছরের জন্য বলবৎ ছিল। ১৯৯৫ সালে পুনর্বিবেচনা করে চুক্তিটির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকে সমর্থন জানায় ১৭৮ টি দেশ। ভারত, পাকিস্তান, ইজরায়েল আগের মতো এবারেও এর শরিক হতে চায়নি। ভারত NPT চুক্তি গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। তার মতে এই চুক্তি বৈষম্যমূলক।

মূল্যায়ণ ঃ সবশেষে উল্লেখযোগ্য, ১৯৯৫ সালের ১১ মার্চ ১৭৮ টি দেশ সর্বসম্মতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য এন.পি.টি.-র মেয়াদ সম্প্রসারণে স্বাক্ষর দিলেও এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ পারমাণবিক অস্ত্রহীন দেশগুলির মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আবার পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক রাষ্ট্রগুলি এই চুক্তির শর্তগুলি পালনে তৎপর তা বলা যাবে না। কোনো দেশই প্রকৃতপক্ষে তার অসস্তরত্যাগ করতে রাজি নয়। পরমাণু বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টোফার পেইন (C. Paine) বলেছেন, "বিশ্বের কোনো

দেশই যে তৈরি অস্ত্র নষ্ট করতে রাজি নয়, ১৯৯৫-এর সম্মেলন থেকে তা আবার প্রমাণিত হল।” তাঁর মতে, “সম্মেলনে যে লক্ষ্যগুলির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি অর্থহীন, নিস্তেজ ও শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়।” ক্যালভোকোরেসি মন্তব্য করেন – “The idea that major power had more in common than the need to avoid mutual annihilation was further fortified by their common interest in their own superiority”। ২০০৬ সালে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।”

সি.টি.বি.টি. বা সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি ও ভারতের ভূমিকা (CTBT role of India) ঃ

পটভূমি ঃ ১৯৯৫ সালের সম্মেলনে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তির (NPT) ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে CTBT বা সর্বাত্মক পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষণ নিষিদ্ধকরণের জন্য উদ্যোগী হয়। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে যতগুলি চুক্তি হয়েছে, সি.টি.বি.টি. তাদের মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে জেনেভাতে ১৯৯৬-এর জুলাই মাসে ৬১ টি দেশ একটি সম্মেলনে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ভারত প্রস্তাবিত চুক্তিটির ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, গোটা বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করতে পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চিন) সুনির্দিষ্ট করে সময়সীমা জানাতে হবে। ভারতের বক্তব্য হল শুধু পরমাণু অণু পরীক্ষা নিষিদ্ধ করলেই বিশ্বের মজুত পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্তি হয়ে যাবে। একটি গোষ্ঠীর হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকবে, অন্যদের হাতে থাকবে না। ভারতের বক্তব্যকে খণ্ডন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলার দাবি মেনে নেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভবপর নয়। ধাপে ধাপেই বিশ্ব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগোবে। যাই হোক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় নতুন করে প্রস্তাব আনিয়ে ১৯৯৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চুক্তিটিকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণ সভার ১৮৫ সদস্যের মধ্যে ১৫৮ টি ভোটে সি.টি.বি.টি. প্রস্তাব পাস হয়ে যায়। চুক্তির খসড়াটি প্রধান কারিগর হলেন ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের।

তবে সি.টি.বি.টি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। কারণ, চুক্তিটির ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, চুক্তির ২নং পরিশিষ্টে যে ৪৪টি দেশের নাম আছে, তাদের প্রত্যেকে অনুমোদন করলে চুক্তিটি কার্যকর হবে। এই ৪৪টি দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও ইজরায়েল রয়েছে। সম্প্রতি ইজরায়েল চুক্তিটি অনুমোদন করলেও ভারত ও পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত এটিকে অনুমোদন করেনি।

প্রস্তাবনা ও বিষয়বস্তু ঃ চুক্তিটির প্রস্তাবনায় বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস এবং সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রস্তাবনায় সর্বাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের একটি অর্থবহ পদক্ষেপ ("A meaningful step in the realization of a systematic process to achieve nuclear disarmament") বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সি.টি.বি.টি.-র ১নং ধারায় বলা হয়েছে, সবাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি যে-কোনো ধরণের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য বিস্ফোরণ বা অন্য কোনো প্রকার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না।

সি.টি.বি.টি.-র ২নং ধারায় এর সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (ক) চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মেলন, (খ) একটি কার্যনির্বাহী পর্ষদ, এবং (গ) একটি প্রায়োগিক সচিবালয় (A Technical Secretariat)-কে নিয়ে 'সি.টি.বি.টি.'-র সংগঠন গঠিত হবে। সংগঠনের জন্যহবে চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও সহযোগিতা করা। সংগঠনের কার্যালয় গঠিত হবে ভিয়েনাতে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন (a conference of the state parties) হল সংগঠনের পরিচালক সংস্থা। এইসম্মেলনের দায়িত্ব হল চুক্তি-সংক্রান্ত নীতিগত বিষয় ও চুক্তির রূপায়ণ তদারকি করা। সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত ৫১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সি.টি.বি.টি.-র, কার্যনর্বাহী পর্ষদ। এই পর্ষদ হবে সি.টি.বি.টি.-র, প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। আর প্রায়োগিক সচিবালয়ের কাজ হবে চুক্তিটি বাস্তবে যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা দেখে। সি.টি.বি.টি.-র ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র চুক্তির দায়দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সি.টি.বি.টি.-র ৪নং ধারায় আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই তদারকি ব্যবস্থার কাজ হবে বিশ্বের কোথাও পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা তা দেখা এবং তাকে চিহ্নিত করা। ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, স্বাক্ষরকারী কোনো রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গ করলে সম্মেলন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। ৬নং ধারায় চুক্তির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে তার মীমাংসা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৭নং ধারায় বলা হয়েছে সি.টি.বি.টি.-

কে সংশোধন করতে হলে চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন। চুক্তির ৮নং ধারায় প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি পর্যালোচনা সম্মেলন (Review conference) আহ্বান করার কথা বলা হয়েছে। এই সম্মেলনে চুক্তির সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হবে।

সি.টি.বি.টি.-র বিরুদ্ধে ভারতসহ কিছু রাষ্ট্রের অভিযোগ ঃ

মূল অভিযোগ ঃ প্রকৃতপক্ষে সি.টি.বি.টি. অনেক দেশের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ভারতসহ লিবিয়া, ভুটান, মিশর, লেবানন, মরিশাস, তানজানিয়া, কিউবা এই চুক্তির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছে। অভিযোগগুলি হল নিম্নরূপ –

১. সি.টি.বি.টি.- মাধ্যমে কেবল পরমাণু অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনকার মজুত পরমাণু অস্ত্রের কী হবে, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সাম্প্রতিক এক হিসব থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সঞ্চিত বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ ৮,৭১১ টি, রাশিয়ার ৬,৮৩৩ টি, ফ্রান্সের ৫২৪ টি, ব্রিটেনের ২০০ টি এবং চিনের ৪৫০ টি। বস্তুত পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে, তার পরিমাণ ১২,০০০ মেগাটনেরও বেশি। এই পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার ধ্বংস করা যায়।

সি.টি.বি.টি. চুক্তির মাধ্যমে পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মজুত পারমাণবিক অস্ত্র পাকাপাকিভাবে রেখে দেবার বন্তোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করার ব্যাপারে উদ্যোগ দেখানো হয়নি।

২. সি.টি.বি.টি.-তে কেবলমাত্র পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, বিশ্বের পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশই উন্নত পরমাণু প্রযুক্তির সাহায্যে ("... with sophisticated computer stimulated techniques at their disposal") বিস্ফোরণ ছাড়াই পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম। সেজন্যই সমালোচকদের মতে, সি.টি.বি.টি. সর্বাত্মকও নয়, আবার মজুত পরমাণু অস্ত্রকে টিকিয়ে রাখা বা উন্নত করার বিরোধীও নয় ("...neither comprehensive nor opposed to the maintenance of exiting stockpile or new additions to it.")।

৩. সি.টি.বি.টি.-র বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ হল এই যে, ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ চিন পরমাণু শক্তিধর দেশ। অপর এক

প্রতিবেশী পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী। সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করবে।

৪. সি.টি.বি.টি.-র যে ধারাটির বিরুদ্ধে ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সেটি হল "Entry Into Force" (EIF) বা বলপূর্বক স্বাক্ষর দান। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রকে চুক্তিতে সই করতে হবে। যদি কোনো রাষ্ট্র সই-না করে, তাহলে বর্তমান স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রগণ ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ভারতের মতে, এটা যে-কোনো দেশের সার্বভৌম অধিকারের বিরোধী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশের সুবিধাজনক অবস্থার স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা। প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মনীতি অনুযায়ী, কোনো দেশকে জোর করে কোনো চুক্তিতে সামিল করা যাবে না।

১৯৯৬ সালে একদিকে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে, অন্যদিকে এই চুক্তিতে সামিল হয়ে চিন তার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ভারত পোখরানে ৫টি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। তারপরে পরেই পাকিস্তানও পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। এখনও পর্যন্ত এ দুটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সি.টি.বি.টি.-র তরফ থেকে তেমন কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বিশ্বকে প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করতে হলে পরমাণু শক্তির দেশগুলিকে ঘোষণা করতে হবে – ক. পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না; খ. একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র তার যাবতীয় পরমাণু অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করে ফেলবে এবং গ. পৃথিবীর রাষ্ট্র আর পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন করবে না। শুধু ঘোষণা করলেই হবে না, এ ব্যাপারে আন্তরিক প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হতে ভারতকে পারমাণবিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং অসামরিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দুটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে এক নতুন গতি দান করেছে। ২০০৮ সালে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তি বাস্তব রূপ গ্রহণ করে।